

সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ১১তম আয়াত সংখ্যাঃ (৮১-৮৯)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ۝ ۮ۱ : ۮ
اللَّهِ وَ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۖ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

৮১. যারা পিছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলুন, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝত।

এখানে সেই মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে শরীক হয়নি এবং মিথ্যা অজুহাত পেশ করে না যাওয়ার অনুমতি নিয়েছিল।

আয়াতে উল্লেখিত مخلفون শব্দটি مخلف এর বহুবচন। অর্থ- পরিত্যক্ত। অর্থাৎ যাকে পরিহার করা ও পিছনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। [বাগভী; কুরতুবী] এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জিহাদে शामिल হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কারণ তারা হয় মুসলিমদের ক্ষতি করত না হয় তাদের অন্তর অপবিত্র হওয়ার কারণে জিহাদের সৌভাগ্য তাদের নসীব হয়নি। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] কাজেই এরা জিহাদ বর্জনকারী নয়; বরং জিহাদ থেকে বর্জিত। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন। [কুরতুবী]

আয়াতে উল্লেখিত خلاف শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে,

একঃ পেছনে বা পরে, আবু ওবায়দা রহমাতুল্লাহ আলাইহি এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিক পক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়।

দ্বিতীয় অর্থ এক্ষেত্রে مخالف অর্থ বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্যান্য লোকদেরকেও এ কথাই বুঝাল যে, “গরমের সময়ে জিহাদে বেরিয়ো না” । [বাগভী; কুরতুবী ইবন কাসীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর; জালালাইন; ফাতহুল কাদীর]

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। [ইবন কাসীর] আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেছেন (قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا) অর্থাৎ এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। মূলত এর ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের না-ফরমানীর দরুন যে জাহান্নামের আগুনে সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না

তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশী? জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তরভাগের একভাগ। বলা হল যে, হে আল্লাহর রাসূল! এতটুকুই তো যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ আগুনের চেয়েও সেটা উনসত্তর গুণ বেশী, প্রতিটির উত্তাপই এর মত। [বুখারী ৩২৬৫; মুসলিম: ২৮৪৩] জাহান্নামের আগুনের আরও আন্দাজ পাওয়া যায় এ হাদীস থেকে, যাতে জুতা ও ফিতা থাকবে, কিন্তু তার উত্তাপে তার মগজ এমনভাবে উৎরাতে থাকবে যেমন পাতিল উনুনের তাপে উত্তরায়। সে জাহান্নামীদের কাউকে তার চেয়ে বেশী শাস্তিপ্রাপ্ত মনে করবে না। অথচ সে সবচেয়ে হাল্কা আযাবপ্রাপ্ত। [বুখারী: ৬৫৬২; মুসলিম: ২১৩]

فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيرًا ۖ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ৮২ : ৯

৮২. কাজেই তারা অল্প কিছু হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে সেসব কাজের প্রতিফল হিসেবে যা কিছু তারা করেছে।

فَلْيُضْحَكُوا আর كَثِيرًا শব্দ দু' টি হতে পারে মাসদারের সিফাত (ক্রিয়ামূলের বিশেষণ), অর্থাৎ, ضَحْكًا قَلِيلًا এবং بُكَاءٍ كَثِيرًا অথবা যারফ (ক্রিয়া-বিশেষণ), (অর্থাৎ, وَزَمَانًا كَثِيرًا অনুযায়ী দুই যবর রয়েছে। আর উভয় শব্দ দু' টিই হল আদেশসূচক, যা খবরের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তার মানে হল, এরা ইহকালে হাসবে কম এবং পরকালে কাঁদবে বেশী।

তফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছে যে, এমনি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। [বাগভী; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতের তফসীরে ইবন আব্বাস থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে “দুনিয়া সামান্য কয়েক দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। তারপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।” [ইবন কাসীর]

"তবে কি তোমরা এই বাণীতে বিস্ময় বোধ করছ? এবং তোমরা হাসছ, কাঁদছ না?" আর তোমরা উদাসীন। সূরা আন-নাযম (আয়াত ৫৯-৬১)

"অতঃপর তোমরা তাদেরকে উপহাসের পাত্র বানিয়েছিলে, এমনকি তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং ** তোমরা তাদের দেখে হাসতে।** আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমন প্রতিফল দিলাম যে, তারাই সফলকাম।" সূরা আল-মু'মিনুন (আয়াত ১১০-১১১)

পাপীদের দুনিয়ার আনন্দ বনাম পরকালের কষ্টের বর্ণনা:

"নিশ্চয় সে (দুনিয়ায়) তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরম আনন্দে ছিল। সে মনে করেছিল যে, সে কখনো (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাবে না।" সূরা আল-ইনশিকাক (আয়াত ১৩-১৪):

রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে পরকালের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দুনিয়াতে অতিরিক্ত হাসাহাসি করতে নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহর ভয়ে কাঁদার ফযীলত বর্ণনা করেছেন:

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার খুতবায় বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি।" এটি শোনার পর সাহাবীগণ তাঁদের মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। (সহীহ বুখারী: ৬৬৩১; সহীহ মুসলিম: ২৩৫৯)

• অতিরিক্ত হাসির অপকারিতা:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা অতিরিক্ত হেসো না। কারণ অতিরিক্ত হাসি অন্তরকে মৃত বা নিষ্ক্রিয় করে দেয়।" (সুনান ইবনে মাজাহ: ৪১৯৩, তিরমিযী)

• আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না ওলান থেকে দোহন করা দুধ পুনরায় ওলানে ফিরে যায় (অর্থাৎ যেমন দুধ ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, তেমন তার জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব)।" (সুনান তিরমিযী: ১৬৩৩)

• জাহান্নামীদের কান্নার তীব্রতা:

তফসীরের কিতাবগুলোতে (যেমন ইবনে কাসীর ও কুরতুবী) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে: "জাহান্নামীদের ওপর কান্নার শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হবে। তারা এত কাঁদবে যে তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে। এরপর তারা রক্ত কাঁদবে, যা তাদের চেহারায় নালার মতো দাগ কেটে বসবে। যদি সেখানে নৌকা চালানো হতো, তবে তা অনায়াসে ভেসে চলত।" (মুসতাদরাক হাকিম)

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَئِنْ تَقَاتَلُوا ۖ : ৮৩
مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ

৮৩. অতঃপর আল্লাহ যদি আপনাকে তাদের কোন দলের কাছে ফেরত আনেন এবং তারা অভিযানে বের হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন আপনি বলবেন, তোমরা তো আমার সাথে কখনো বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে; কাজেই যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসেই থাক।

এ সম্প্রদায় থেকে মুনাফিকদল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এরা যদি ভবিষ্যতে কোন জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বকার মতই নানা রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নির্দেশ হল যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জিহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জিহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অধিকাংশ তফসীরবিদ

বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শান্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; আদওয়াউল বায়ান]

অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদেরকে অনুরূপ ভাল কাজে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, “তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, ‘আমাদেরকে তোমাদের সংগে যেতে দাও। তারা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, ‘তোমরা কিছুতেই আমাদের সংগী হতে পারবে না। আল্লাহ আগেই এরূপ ঘোষণা করেছেন।” [সূরা আল-ফাতহঃ ১৫]

কারণ, তাদের এক অপরাধ অন্য অপরাধকে ডেকে এনেছে, আল্লাহ অন্যত্র বলেন, “আর তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি, তেমনি আমরাও তাদের অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ পাণ্টে দেব এবং আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মত ঘরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব। [সূরা আল-আনআমঃ ১১০]

এখন তোমাদের এমন অবস্থা যে, তোমরা সেই নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের সাথে বসে থাক, যারা যুদ্ধে শরীক হওয়ার পরিবর্তে ঘরে বসে থাকে। নবী (সাঃ)-কে এই নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের সেই দুঃখ-বেদনা আরো বন্ধি পায়, যা তারা পিছনে থাকার কারণে পেয়েছে।

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَا تَعْمَلُ إِلَّا تَوَافُؤًا ۚ وَهُمْ فِي سَفَرٍ

৮৪. আর তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং ফাসেক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

তাবুক থেকে ফিরে আসার পর বেশী দিন যেতে না যেতেই মুনাফীক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলো। তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি নবী (সা.) এর খেদমতে হাযির হয়ে কাফনে ব্যবহারের জন্য তাঁর কোর্তা চাইলেন। তিনি অত্যন্ত উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে কোর্তা দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ তাঁকেই জানাযার নামায পড়াবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি এ জন্যও তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত উমর(রা.) বারবার এ মর্মে আবেদন জানাতে লাগলেন-হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এমন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াবেন যে অমুক অমুক কাজ করেছে? কিন্তু তিনি তার এ সমস্ত কথা শুনে মুচকি হাসতে লাগলেন। তার অন্তরে শত্রু মিত্র সবার প্রতি যে করুনার ধারা প্রবাহিত ছিল তারি কারণে তিনি ইসলামের এ নিকষ্টতম শত্রুর মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেও ইতস্তত করলেন না।

উমার (রাঃ) নবী (সাঃ)-কে বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা এমন লোকের জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন, তাহলে আপনি কেন এর ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনার দু’ আ করবেন?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলা আমাকে এর এখতিয়ার দান করেছেন। অর্থাৎ, বাধা দেননি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘যদি তুমি ৭০ বার তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।’ আমি তার জন্য ৭০ বার অপেক্ষা অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব।’ সুতরাং তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ এই আয়াত অবতীর্ণ

করে বললেন, আগামীতে মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দু' আ কোনক্রমেই করা যাবে না। (বুখারী, সূরা বারাতের ব্যাখ্যা, মুসলিম মুনাফিকদের বিবরণ)

এটা ছিল জানাযার নামায ও ক্ষমা প্রার্থনা নিষেধ হওয়ার কারণবিশেষ। যার অর্থ হল যাদের মৃত্যু কুফরী, শিরক ও মুনাফিকীর উপর হবে, তাদের না জানাযা নামায পড়া হবে, আর না তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয হবে। এক হাদীসে তো এমনও এসেছে যে, নবী (সাঃ) যখন কবরস্থানে পৌঁছলেন তখন জানা গেল যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে দাফন করে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাকে কবর থেকে বের করতে আদেশ করলেন। তিনি তাকে নিজের হাঁটুর উপর রেখে তার উপর নিজ মুখের (বরকতময়) থুথু মারলেন। অতঃপর তাঁর কামীস তাকে পরিয়ে দিলেন। (বুখারীঃ কামীস পরিধান পরিচ্ছেদ, জানাযা অধ্যায়, মুসলিমঃ মুনাফিকদের মন্দ গুণাবলী পরিচ্ছেদ) কিন্তু এ সব তার কোন কাজে আসেনি। এ হতে জানা গেল যে, যে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে, তার জন্য পৃথিবীর বড় বড় ব্যক্তিত্বের ক্ষমা প্রার্থনার দু' আ এবং সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না।

এ থেকে শরীয়াতের এ বিষয়টি স্থিরকৃত হয়েছে যে, ফাসেক, অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী কাজকর্মের লিপ্ত ব্যক্তি এবং ফাসেক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির জানাযার নামায মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃস্থানীয় লোকদের পড়ানো উচিত নয়। তাতে শরীক হওয়াও উচিত নয়। এ আয়াত গুলো নাযিল হবার পর নবী (সা.) নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে কোন জানাযার শরীক হবার জন্য তাকে ডাকা হলে তিনি প্রথমে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। জিজ্ঞেস করতেন, সে কেমন ছিল। যদি জানতে পারতেন সে অসৎ চরিত্রের অধিকারী ছিল, তাহলে তার পরিবারের লোকদের বলে দিতেন, তোমরা যেভাবে চাও একে দাফন করে দিতে পারো।

আবু কাতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে যখন কোন জানাযা হাজির হতো, তখন তিনি তার সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞেস করতেন, তারা যদি ভালো বলে সত্যায়ন করত তখন তিনি তার উপর সালাত আদায় করতেন। পক্ষান্তরে যদি তারা তার সম্পর্কে অন্য কিছু বলতো, তখন তিনি বলতেন, তোমরা এটাকে নিয়ে কি করবে কর, তিনি নিজে সালাত আদায় করতেন না। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৯৯]

অথচ যদি ঈমানদার হতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম তার জন্য দোআ করার জন্য কবরের পাশে দাঁড়াতেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, যে কেউ জানাযার সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবে তার জন্য এক কীরাত, আর যে কেউ সালাত শেষ হওয়ার পর দাফন পর্যন্ত থাকবে তার জন্য দুই কীরাত। বলা হল, কেমন দুই কীরাত? তিনি বললেন, তার ছোটটি ওহুদ পাহাড়ের সমতুল্য। [বুখারী: ১৩২৫; মুসলিম: ৯৪৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম যখন দাফন শেষ করতেন, তখন তার কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও, আর তার জন্য স্থিতি বা দৃঢ়তার জন্য দো'আ কর; কেননা তাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে। [আবু দাউদ: ৩২২১]

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ ٨٥

৮৫. আর তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ তো এগুলোর দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শান্তি দিতে চান; আর তারা কাফের থাকার অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করে।

আয়াতে সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকেছিল। সেসব মুনাফিকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলিমদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহর নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নেয়ামত পাবে? এর উত্তরে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন রহমত ও নেয়ামত নয়; বরং পার্থিবজীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাব বিশেষ। আখেরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধন-সম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না।

আরাম আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধন-সম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসাবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। তারা যখন মারা যায় তখনো এগুলোর ভালবাসা তাদের অন্তরে বেশী থাকার কারণে তাদের মৃত্যু হলেও সম্পদ হারানোর কারণে ভীষণ কষ্টে থাকে। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় **لِيُعَذِّبَهُمْ** বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত ধন সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শান্তি দিতে চান। সুতরাং এ কথা কক্ষনো ভাবা যাবে না যে, তাদেরকে এগুলো দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন। বরং এগুলো দিয়ে তিনি তাদেরকে অপমানিত করেছেন। [সা'দী; ইগাসাতুল লাহফান]

সূরা আত-তাওবাহ (৯:৫৫): "আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিমুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো এর দ্বারাই দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে শান্তি দিতে চান এবং তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হোক কাফের অবস্থায়।" (এটি হুবহু একই বিষয়বস্তুর আরেকটি আয়াত, যা একই সূরার ৫৫ নম্বর আয়াতে আগে উল্লেখ করা হয়েছে)

সূরা আল-ইমরান (৩:১৭৮): "আর কাফেররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমরা তাদের যে অবকাশ দিচ্ছি, তা তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর। আমরা তো তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়, আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শান্তি।"

সূরা আল-মু'মিনুন (২৩:৫৫-৫৬): "তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করছি, তার মাধ্যমে তাদের জন্য কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি? না, বরং তারা বোঝে না।"

• উত্তরাধিকার ও দুনিয়ার মোহ সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করি না, বরং আমি ভয় করি যে তোমাদের সামনে দুনিয়ার প্রাচুর্য প্রসারিত করে দেওয়া হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তোমরাও দুনিয়ার মোহে লিপ্ত হয়ে পড়বে যেমন তারা পড়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে যেমন তাদের ধ্বংস করেছিল।" (সহীহ বুখারী-৬৪২৫):

- ইস্তিদরাজ (আল্লাহর পক্ষ থেকে ঢিল দেওয়া) সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তুমি যখন দেখবে যে, আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে তার অবাধ্যতা ও পাপের ভেতরে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তার ইচ্ছানুযায়ী দুনিয়ার নেয়ামত দান করছেন, তখন বুঝে নিবে যে, এটি কেবলই 'ইস্তিদরাজ' (ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢিল দেওয়া)।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা আল-আন'আমের ৪৪ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন। (মুসনাদে আহমাদ ১৭৩১১):

অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ করা হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম: ফলে তখনি তারা নিরাশ হল। সূরা আনয়ামঃ ৪৪

- কাফেরদের দুনিয়াবী সুখ সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা কোনো মুমিনের নেক আমলের প্রতি জুলুম করেন না (সব আমলের প্রতিদান দেন)। মুমিনকে তার আমলের কারণে দুনিয়াতেও রিজিক দেওয়া হয় এবং আখেরাতেও তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আর কাফের ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ায় যেসব ভালো কাজ করে, দুনিয়াতেই তাকে তার ধন-সম্পদ ও প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি সে যখন আখেরাতে পৌঁছাবে, তখন তার এমন কোনো নেক আমল থাকবে না যার প্রতিদান সে পেতে পারে।" (সহীহ মুসলিম ২৮০৮):

وَ إِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَ جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَ قَالُوا ذَرْنَا ۖ نَكُنْ مَعَ الْقُعْدِيِّينَ ۖ

৮৬. আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর—এ মর্মে যখন কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তারা আপনার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে রেহাই দ্বীন, যারা বসে থাকে আমরা তাদের সাথেই থাকব।

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۖ

৮৭. তারা অন্তঃপুর বাসিনীদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করেছে এবং তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দেয়া হলো; ফলে তারা বুঝতে পারে না।

এটা হল সেই মুনাফিকদের বর্ণনা যারা ছল-বাহানা করে যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে পিছনে থাকা পছন্দ করেছিল। أُولُو الطُّوْلِ থেকে উদ্দেশ্য সামর্থ্যবান, ধনী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। অর্থাৎ, এমন লোকদেরকে পিছনে থাকা উচিত ছিল না। কেননা, তাদের কাছে আল্লাহর দেওয়া সব কিছু মওজুদ ছিল। فَاعِدِينَ থেকে কিছু অসুবিধার কারণে 'বসে থাকা' ব্যক্তির উদ্দেশ্য। যেমন, পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে অন্তঃপুরবাসী নারীদের সাথে তুলনা করে خَوَالِفِ বলা হয়েছে। যা خَالِفَةٌ এর বহুবচন অর্থাৎ, পিছনে থাকা নারীগণ।

যদিও এটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ, সুঠামদেহী ও সামর্থ্যবান লোকেরা ঈমানদেব দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও কাজের সময় মাঠে ময়দানে বের হবার পরিবর্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে থাকবে এবং মেয়েদের দলে शामिल হবে, তবুও যেহেতু এ লোকেরা জেনে বুঝে নিজেদের জন্য এ পথটি পছন্দ করে

নিয়েছিল তাই প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের থেকে এমন সব পবিত্র অনুভূতি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে যেগুলোর উপস্থিতিতে মানুষ এ ধরনের ঘৃণ্য আচরণ করতে লজ্জাবোধ করে।

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; আর তাদের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে; এটাই মহাসাফল্য।

মুনাফিকদের বিপরীত ঈমানদারদের অভ্যাস হল, তারা নিজ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। আল্লাহর পথে জান-মাল কুরবান করার ব্যাপারে কোন পরোয়া ও দ্বিধাবোধ করে না। তাদের নিকটে আল্লাহর আদেশ পালনই হল সর্ব উচ্ছে। তাদেরই জন্য আখেরাতের মঙ্গল ও জান্নাতের নিয়ামত প্রস্তুত রয়েছে; মতান্তরে দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। আর এরাই লাভ করবে পরিভ্রাণ ও মহাসাফল্য।

জান-মাল দিয়ে জিহাদকে 'বেদনাদায়ক আযাব থেকে মুক্তির ব্যবসা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদের বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে..." সূরা আস-সফ (৬১:১০-১১)

প্রকৃত মুমিনের সংজ্ঞায় জান-মাল দিয়ে জিহাদের কথা বলা হয়েছে—

"মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।" সূরা আল-হুজুরাত (৪৯:১৫)

ঘরে বসে থাকা লোক এবং জিহাদকারীদের মর্যাদার পার্থক্য—

...যারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা ঘরে বসে থাকা লোকদের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছেন..." সূরা আন-নিসা (৪:৯৫)

• জিহাদের সর্বোত্তম মর্যাদা:

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম?" তিনি বললেন—"ঐ মুমিন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর পথে নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৮৬; সহীহ মুসলিম)

- জান ও মালের কোরবানি আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—“আল্লাহর পথে সকাল অথবা সন্ধ্যায় সামান্য সময় ব্যয় করা গোটা দুনিয়া এবং এর ভেতরের সমস্ত সম্পদ লাভ করার চেয়েও উত্তম।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯২)

- জিহাদের মূল লক্ষ্য:

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, কেউ স্বগোষ্ঠীয় মর্যাদার জন্য, আবার কেউ লোকদেখানোর জন্য যুদ্ধ করে; এদের মধ্যে কার যুদ্ধ আল্লাহর পথে হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন—“যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে (দীনকে) সমুল্যত ও বিজয়ী করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, কেবল তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে গণ্য হবে।” (সহীহ বুখারী, ২৮১০; সহীহ মুসলিম)

ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ অনুযায়ী, এই আয়াতে তৎকালীন মুনাফিকদের কাপুরুষতা এবং ঘরে বসে থাকার মানসিকতার তীব্র নিন্দা করার পর, আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সা.) এবং তাঁর একনিষ্ঠ ও ত্যাগী সাহাবীদের প্রশংসা করছেন। তাঁরা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে জান-মাল বাজি রেখেছিলেন বলেই আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের জন্য সর্বাঙ্গীন কল্যাণের গ্যারান্টি দিয়েছেন।